১
সচিত্র স্বাস্থ্য-সমাজ কথা
অরুণকুমার
চট্টোপাধ্যায়
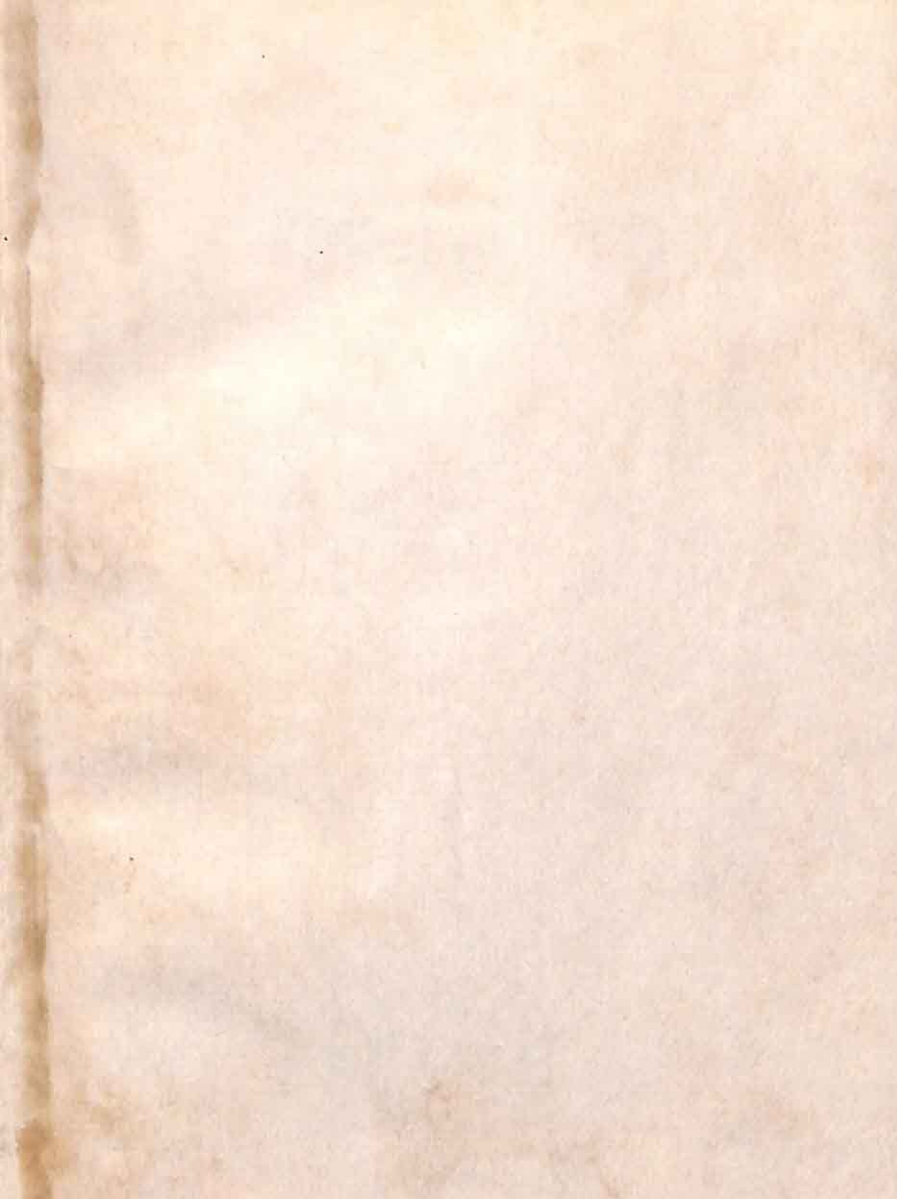
সচিত্র

স্বাস্থ্য-সমাজ কথা

সন্দীপ সেন

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মে ১৯৮৭

৮ টাকা

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক হেমপ্রভা
প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত ॥

সূচীপত্র

॥ স্বাস্থ্য ॥

॥ সমাজ ॥

স্বাস্থ্য

॥ গোড়ার কথা ॥

আমরা সুখ চাই। আনন্দ চাই। আনন্দে লেখাপড়া করতে চাই, খেলাধূলা করতে চাই। বড় হয়ে মানুষের মতো হতে চাই।

কিন্তু তা হতে গেলে, যেটা আমাদের সবচেয়ে দরকার, তা হলো মজবুত শরীর, অটুট স্বাস্থ্য।

তোমরা নিজেরাই দেখেছ, শরীর যদি ভাল না থাকে তো, কিছুই ভাল লাগে না। পড়তে ভাল লাগে না, খেলতে ভাল লাগে না। ভাল ভাল খাবারেও মন বসে না। শরীর যার ভাল নয়, সে হামেশাই অসুখে ভোগে। বাঁচেও না বেশী দিন। আর বাঁচলেও জীবনে কোন বড় কাজ করতে পারে না, সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না।

আর যার শরীর ভাল, সে অসুখে ভোগে না। শরীরে অসুখ না হলেই সুখ। সুখ পেতে হলে তাই শরীরকে ভাল রাখতে হবে। এমন ভাবে চলতে হবে, যাতে শরীরে অসুখ না হয়, রোগ না হয়।

সুতরাং শরীর ভাল থাকা মানে সুস্থ থাকা, স্বাস্থ্য ভাল থাকা। যার শরীর নিরোগ ও সবল, বলতে হবে—তার স্বাস্থ্য

ভাল। জীবনে সে সুখ পায়। বড় কাজ করতে পারে। কাজ করে সে আনন্দ পায়। তাই লোকে বলে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

সুস্থ বালক রুগ্ন বালক

কিন্তু বিনা যত্নে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। আমরা যা খুশি করব, অথচ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে—তা হয় না কখনো। তার জন্যে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা দরকার। সেই নিয়মগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন—(১) শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, (২) উপযুক্ত আহার অর্থাৎ ঠিক-মত খাওয়া-দাওয়া, এবং (৩) উপযুক্ত ব্যায়াম ও বিশ্রাম।

প্রথম অধ্যায়

॥ পরিচ্ছন্নতা ॥

জীবাণু — সকলের আগে দরকার নিজের দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, শরীরের ভিতরে ও বাহিরে যাতে কোন ময়লা না জমে, সেদিকে ঠিকমত নজর রাখা। কেন, জান? ময়লার মধ্যে নানা রোগের জীবাণু থাকে। সেই সব জীবাণু যখন শরীরকে আক্রমণ করে, তখনই রোগ হয়। জীবাণু হচ্ছে অতি ছোট কীট; এত ছোট যে, খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তাররা তাদের দেখে রোগ নির্ণয় করেন। এক এক রোগের জীবাণু এক এক রকম। এক এক রকমের ময়লায় থাকে এক এক রকমের জীবাণু।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

কাজেই, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, সকল রকম ময়লা থেকে শরীরকে মুক্ত রাখা কত দরকার। তার জন্য কতকগুলি অভ্যাস প্রয়োজন।

মলমূত্র ত্যাগ — রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পায়খানায় যাওয়া প্রয়োজন। মলমূত্রের মতো ময়লা জিনিস আর নেই, তার মধ্যে থাকে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নানারকমের জীবাণু। তাই ভোরে ঘুম থেকে উঠেই মলমূত্র শরীর থেকে বের

করে দেওয়া দরকার। সকালে কোষ্ঠ সাফ হলে শরীর ও মন দুইই ভাল থাকে, আর সহজে কোন রোগ হতে পারে না।

দাঁত মাজা — আমরা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে যা খাই, তার কণা দাঁতের ফাঁকে জমে থাকে। সেগুলি যদি পরিষ্কার না করা হয়, তবে সেগুলি পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়, আর তার মধ্যে নানা রোগের জীবাণুও জন্মে। তার ফলে দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, রক্তপড়া, পূঁজ হওয়া প্রভৃতি থেকে শুরু করে নানা কঠিন ব্যাধিও হতে পারে; অকালে দাঁত পড়েও যায়। কাজেই রোজ দাঁত মেজে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করা দরকার।

অকালে দাঁত পড়ে মুখ ফোকলা হয়ে গেছে

ঘুঁটের ছাই দিয়ে অনেকে দাঁত মাজে। ঘুঁটের ছাইয়ে দাঁত পরিষ্কার হয় ঠিকই, কিন্তু দাঁতের এনামেল জাতীয় জিনিসটা ক্ষয়ে যায়। কাজেই ঘুঁটের ছাই দিয়ে তোমরা দাঁত মাজবে না। অনেকে কাঠ কয়লার গুঁড়োও ব্যবহার করে। চক বা খড়ির গুঁড়ো আরো ভাল।

লবণ ও গরম জল — একটু লবণ মেশান গরম জল দিয়ে কুলকুচো করতে পারলে খুব ভাল হয়; তাতে

দাঁতের গোঁড়া পরিষ্কার তো হয়ই ; তা ছাড়া শক্তও হয়, আর মুখও খুব ভাল পরিষ্কার হয়।

বুরুশ ও দাঁতন — দাঁতের ফাঁকগুলি পরিষ্কার করার সবচেয়ে ভাল উপায় দাঁতন ব্যবহার। আঙুলের সাহায্যে গুঁড়ো মাজন দিয়ে দাঁত মাজার পর অনেকে বুরুশ দিয়ে দাঁতের ফাঁকগুলো সাফ করে থাকেন। গুঁড়োর বদলে টুথপেস্ট দিয়ে বুরুশের সাহায্যে দাঁত মাজাও ভাল। কিন্তু সবচেয়ে কম খরচে অথচ সবচেয়ে ভালভাবে দাঁত মাজার উপায় হচ্ছে দাঁতনের ব্যবহার। আবার সবচেয়ে ভাল ও উপকারী হচ্ছে নিমের দাঁতন। দাঁতনের একটা দিক চিবিয়ে বুরুশের মতো করে নিয়ে দাঁতের ওপর ঘষতে হয়। দাঁতের ভিতরের দিকটাও সাফ করা দরকার। রোজ একটা করে নতুন দাঁতন ব্যবহার করা উচিত। দাঁতন ব্যবহার করলে দাঁতের গোড়া শক্তও হয়।

নিমডাল ও ব্রাস দাঁতের পক্ষে ভাল

স্নান — শরীর পরিষ্কার রাখার সব চাইতে ভাল উপায় হচ্ছে নিয়মিত স্নান। গায়ে সরিষার তেল এবং মাথায় নারিকেল তেল মেখে স্নান করা উচিত। সরিষায় তেল গায়ের চামড়ার পক্ষে ভাল, আর নারিকেল তেল চুলের পক্ষে উপকারী।

আমাদের গায়ের লোমের গোড়ায় ছোট ছোট যে গর্ত থাকে তাকে লোমকূপ বলে। লোমকূপের ভিতর দিয়ে ঘাম বের হয়,

করে দেওয়া দরকার। সকালে কোষ্ঠ সাফ হলে শরীর ও মন দুইই ভাল থাকে, আর সহজে কোন রোগ হতে পারে না।

দাঁত মাজা — আমরা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে যা খাই, তার কণা দাঁতের ফাঁকে জমে থাকে। সেগুলি যদি পরিষ্কার না করা হয়, তবে সেগুলি পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়, আর তার মধ্যে নানা রোগের জীবাণুও জন্মে। তার ফলে দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, রক্তপড়া, পূঁজ হওয়া প্রভৃতি থেকে শুরু করে নানা কঠিন ব্যাধিও হতে পারে; অকালে দাঁত পড়েও যায়। কাজেই রোজ দাঁত মেজে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করা দরকার।

অকালে দাঁত পড়ে মুখ ফোকলা হয়ে গেছে

ঘুঁটের ছাই দিয়ে অনেকে দাঁত মাজে। ঘুঁটের ছাইয়ে দাঁত পরিষ্কার হয় ঠিকই, কিন্তু দাঁতের এনামেল জাতীয় জিনিসটা ক্ষয়ে যায়। কাজেই ঘুঁটের ছাই দিয়ে তোমরা দাঁত মাজবে না। অনেকে কাঠ কয়লার গুঁড়োও ব্যবহার করে। চক বা খড়ির গুঁড়ো আরো ভাল।

লবণ ও গরম জল — একটু লবণ মেশান গরম জল দিয়ে কুলকুচো করতে পারলে খুব ভাল হয়; তাতে

দাঁতের গোঁড়া পরিষ্কার তো হয়ই ; তা ছাড়া শক্তও হয়, আর মুখও খুব ভাল পরিষ্কার হয়।

বুরুশ ও দাঁতন — দাঁতের ফাঁকগুলি পরিষ্কার করার সবচেয়ে ভাল উপায় দাঁতন ব্যবহার। আঙুলের সাহায্যে গুঁড়ো মাজন দিয়ে দাঁত মাজার পর অনেকে বুরুশ দিয়ে দাঁতের ফাঁকগুলো সাফ করে থাকেন। গুঁড়োর বদলে টুথপেস্ট দিয়ে বুরুশের সাহায্যে দাঁত মাজাও ভাল। কিন্তু সবচেয়ে কম খরচে অথচ সবচেয়ে ভালভাবে দাঁত মাজার উপায় হচ্ছে দাঁতনের ব্যবহার। আবার সবচেয়ে ভাল ও উপকারী হচ্ছে নিমের দাঁতন। দাঁতনের একটা দিক চিবিয়ে বুরুশের মতো করে নিয়ে দাঁতের ওপর ঘষতে হয়। দাঁতের ভিতরের দিকটাও সাফ করা দরকার। রোজ একটা করে নতুন দাঁতন ব্যবহার করা উচিত। দাঁতন ব্যবহার করলে দাঁতের গোড়া শক্তও হয়।

নিমডাল ও ব্রাস দাঁতের পক্ষে ভাল

স্নান — শরীর পরিষ্কার রাখার সব চাইতে ভাল উপায় হচ্ছে নিয়মিত স্নান। গায়ে সরিষার তেল এবং মাথায় নারিকেল তেল মেখে স্নান করা উচিত। সরিষায় তেল গায়ের চামড়ার পক্ষে ভাল, আর নারিকেল তেল চুলের পক্ষে উপকারী।

আমাদের গায়ের লোমের গোড়ায় ছোট ছোট যে গর্ত থাকে তাকে লোমকূপ বলে। লোমকূপের ভিতর দিয়ে ঘাম বের হয়,

আর সেই ঘামের সঙ্গে শরীরের ভিতরকার অনেক ময়লাও বের হয়ে যায়। সুতরাং লোমকূপগুলিকে পরিষ্কার রাখা দরকার। স্নানের সময় গামছা দিয়ে গা রগড়ে বা গায়ে সাবান মেখে স্নান করলে লোমকূপ পরিষ্কার হয়ে যায়। তাতে ঘাম বা শরীরের ময়লা বের হতে আর কোন অসুবিধা থাকে না। মাঝে মাঝে মাথায় সাবান মেখে স্নান করা উচিত। তাতে মাথার ময়লা পরিষ্কার হয়।

মাথা আঁচড়ান — স্নান করে মাথা মুছে চিরুনি দিয়ে ভাল করে মাথা আঁচড়ে ফেলা উচিত; তাতে চুলের ময়লা সাফ হয়ে যায়। চুলের গোড়াও সাফ হয়।

মাথা আঁচড়ান ও না আঁচড়ানর তফাত

চর্মরোগ — স্নান না করেলে গায়ে ময়লা জমে লোমকূপগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে শরীরের ভিতরের ময়লা বের হতে পারে না। তাতে দাদ, চুলকানি, খোস-পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ জন্মে। মাথার চুলের গোড়া পরিষ্কার না থাকলে মাথায় মরামাস নামক চর্মরোগ হয় ও উকুন জন্মে।

তোমরা জান, চোখে পিঁচুটি, নাকে শিকনি, কানে খোল হয়। তার জন্যে রোজ সকালে দাঁত মাজা ও মুখ ধোওয়ার সময় পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে চোখ, নাক, কানের পাতা ভাল করে ধুয়ে ফেলবে, আর মাঝে মাঝে কানের খোল বের করে কান পরিষ্কার করবে। স্নানের সময় কানে যাতে জল না যায়, সেদিকে নজর রাখবে। কানে জল ঢুকলে পুঁজ হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কাকে পুঁজ
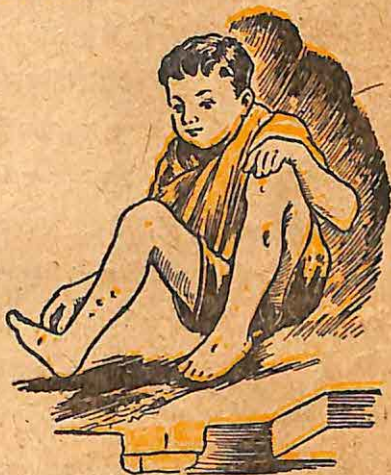
স্নান না করার দুঃখ

হয়ে কেউ কেউ কানে আর শুনতে পায় না, সারা জীবনের মতো কালা হয়ে যায়।

কয়েকটি বদ অভ্যাস — দাঁত দিয়ে নখ কাটা, যেখানে সেখানে থুতু, কফ বা শিকনি ফেলা বা জামাকাপড়ে শিকনি মোছা—এসব খুব খারাপ অভ্যাস। দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নখের ময়লা পেটে গিয়ে পেটের অসুখ হয়। থুতু, কফ বা শিকনির সঙ্গে অনেক সময় নানা রোগের জীবাণু থাকে। ঐ সব থুতু বা কফে মাছি বসলে তাদের পায়ে ঐ ময়লা এবং রোগের জীবাণু আটকে যায়; সেই মাছি যদি খাবারে বসে, তবে নানা রোগের জীবাণুও খাবারের সঙ্গে মিশে শরীরের মধ্যে

ঢুকে নানা রোগের সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই থুতু, কফ প্রভৃতি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা অভ্যাস করা দরকার। সরা বা গামলা জাতীয় কোন পাত্রে খানিকটা গুঁড়ো চুন রেখে তার উপর থুতু-কফ ফেলার ব্যবস্থা করবে, আর রোজ তার উপর থেকে খানিকটা চুনসুদ্ধ ময়লা ফেলে দেবে। জেনে রাখবে, চুনে জীবাণু মারার শক্তি আছে।

চুনের পাত্রে থুতু ফেলছে

অনেক ছেলে থুতু দিয়ে শ্লেট মোছে; এটা ভারী বদ অভ্যাস। যখন তখন নাকে আঙুল দেওয়া আর একটা নোংরা বদ অভ্যাস। এ সব অভ্যাস ছাড়া দরকার।

ঠিকভাবে শোয়া, বসা, দাঁড়ান বা চলা অভ্যাস করতে হয়। অনেকে কাত হয়ে গুটিসুটি মেরে শোয়। এটা একটা বদ অভ্যাস। এভাবে শুলে শরীরে সহজ-ভাবে রক্ত চলাচল করতে পারে না। কুঁজো হয়ে বসা, মেঝেতে বসে বইয়ের উপর ঝুঁকে বই পড়া আর একটা বদ অভ্যাস। ওতে পিঠের শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে

মেরুদণ্ড সোজা করে বসবে

যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজেরও ব্যাঘাত হয়। মেঝের বসে লেখাপড়া করতে হলে একখানা ভাল চৌকি বা ছোট ডেস্ক যোগাড় করে নেবে এবং তার উপর বই-খাতা রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে লেখাপড়া করবে। দাঁড়াবেও সোজা হয়ে বুক চিতিয়ে, আর চলার সময়ও বুক চিতিয়ে চলবে। এ সব অভ্যাস করলে শরীরের গঠনও ভাল হবে, আর রক্ত চলাচল, শ্বাস প্রভৃতি ভালভাবে হওয়ায় শরীর সুস্থ থাকবে, সবল হবে।

সোজা হয়ে দাঁড়াবে   কুঁজো হয়ে দাঁড়াবে না

বাড়িঘর, কাপড়চোপড় ও বিছানা — শরীরের প্রতি এত যত্ন নিয়েও কিন্তু শরীরকে সুস্থ রাখতে পারবে না, যদি বাড়িঘর, কাপড়চোপড়, বিছানা প্রভৃতি নোংরা থাকে। রোগের জীবাণু নোংরাতেই থাকে। বাড়িঘর নোংরা থাকলে, কিংবা ময়লা কাপড়চোপড়, বিছানা ব্যবহার করলে সেই নোংরা বা ময়লার সঙ্গে রোগের জীবাণু শরীরে ঢুকে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই জামাকাপড়, বিছানার চাদর, লেপ-তোশক, বালিশের ওয়াড় কিছুদিন পরে পরেই সাবান মেখে বা সোডার জলে ফুটিয়ে পরিষ্কার করা উচিত। লেপ, তোশক, বালিশ মাঝে মাঝে রোদে দিতে হয়।

বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা — বাড়ি, ঘরদোর সব সময় পরিষ্কার রাখা চাই। ঝাঁট দেওয়া, ঝুল ঝাড়া, ধোওয়া-মোছা করে ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে হয়। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে নোংরা হয় রান্নাঘর। উনুনের ধোঁয়ায় কালি-ঝুল হয়, উনুনের ছাই, মাছের আঁশ, ভাতের ফেন, তরি-তরকারির খোসা প্রভৃতি

পরিষ্কার রান্নাঘর

যদি ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা না হয়, তাতেও ঘর নোংরা হয়। এই সব নোংরার উপর মাছি বসে, তারপর সেই মাছি খাবারে বসলে মাছির পা থেকে দুষ্ট জীবাণু খাবারে প্রবেশ করে। উনুনের ধোঁয়া যাতে ঘরের বাইরে চলে যায় সে রকম ব্যবস্থাও থাকা দরকার, আর সে ধোঁয়া যাতে শোবার বা বসবার ঘরে ঢুকতে না পারে, সে দিকেও নজর রাখতে হয়। বাসন ধোয়া

জল, ফেন, প্রভৃতি নালিতে ফেলা দরকার, নালিটিও জল ঢেলে পরিষ্কার করে দেবে। রোজ সকালে রান্না ঘরের মেঝে ও নালি ফিনাইল-জল দিয়ে একবার করে ধুয়ে দেওয়া দরকার। ফিনাইলে জীবাণু মরে।

শহরে যারা বাস করে তাদের উচিত তরকারির খোসা প্রভৃতি আবর্জনা বাড়ির বাইরে জঞ্জাল ফেলার জায়গায় ফেলা।

বাড়ির বাইরে ময়লা ফেলবে

গ্রামে বাড়ি হলে তরকারির খোসা, ভাতের ফেন প্রভৃতি গরুকে খেতে দেবে ; অন্যান্য আবর্জনা বাসগৃহ থেকে একটু দূরে একটা বড় গর্ত করে তার মধ্যে ফেললে, সেগুলি পচে সবজি বাগানের জমির সারের কাজ করতে পারে। আর তা-ও যদি সম্ভব না

হয়, তবে সেগুলি বাড়ি থেকে একটু দূরে ফেলবে। মাঝে মাঝে সেই জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেবে। ইহাতে জীবাণু মরে যায়।

তারপর সবচেয়ে নোংরা জায়গা পায়খানার কথা।

শহরে পাকা পায়খানা আছে প্রত্যেক বাড়িতে, আর সেগুলি থাকে বাসগৃহের অতি নিকটে; সুতরাং সেগুলিকে দুই বেলা ফিনাইল-জল দিয়ে ধোয়া দরকার। ফিনাইল-জলে দুর্গন্ধও নষ্ট হয়, জীবাণুও মারা যায়।

গ্রামে এইরকম পায়খানা থাকবে

গ্রামে পায়খানার সংখ্যা কম, অনেক বাড়িতেই পায়খানা নেই। লোকে সাধারণত মাঠ, নদী বা রাস্তার ধারে ঝোপে-ঝাপে মলমূত্র ত্যাগ করে। সেগুলি সেখানেই জমে ও পচে। যেখানে সেখানে এই মলমূত্র পচা অতি বিপজ্জনক ব্যাপার।

তাই দেখা যায়, গ্রামে কলেরা হলে প্রায়ই ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, মহামারীর মড়ক দেখা দেয়, অনেক লোক মরে।

সুতরাং যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস অত্যন্ত বদ অভ্যাস। এই বদ অভ্যাস ত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। লোকালয় থেকে দূরে এক একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বড় বড় গর্ত করে, সেখানে পায়খানা করা উচিত। প্রস্রাব ও জলশৌচের জন্য সামনে একটা করে নালা কেটে নিলে গর্তে জল পড়ে মল পচতে পারে না। মলের উপর প্রত্যেকবার কিছু মাটি চাপা দিলে মল থেকে রোগ ছড়াবার ভয় সম্পূর্ণ দূর হবে। প্রস্রাবের জায়গাও বাড়ি থেকে একটু দূরে করা উচিত।

খালি পায়ে মাঠে খেলা করে বাড়ি এসে পা না ধুয়ে ঘরে ঢুকবে না, তাতে ঘরের মেঝের ময়লা লাগে। আর পা না ধুয়েমুছে বিছানায় উঠবে না, তাতে বিছানা ময়লা হয়।

অনুশীলনী

১। নোংরার মধ্যে কি থাকে? শরীর নোংরা থাকলে কি হয়?

২। প্রত্যহ ভোরে পায়খানায় যাওয়া প্রয়োজন কেন?

৩। দাঁত না মাজলে কি হয়? কি ভাবে দাঁত মাজা ভাল? কেন?

৪। রোজ তেল মেখে স্নান করা প্রয়োজন কেন?

৫। লোমকূপ কাকে বলে? তা দিয়ে শরীরের কি কাজ হয়?

৬। চর্মরোগ কাকে বলে? কেন হয়? মাথায় মরামাস বা উকুন কেন হয়?

৭। চোখ, নাক, কান কি ভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়? নখ পরিষ্কার রাখা দরকার কেন? দাঁত দিয়ে নখ কাটা ভাল নয় কেন?

৮। যেখানে সেখানে কফ, থুতু, শিকনি ফেলা বা জামাকাপড়ে শিকনি মোছা ভাল নয় কেন?

৯। কি রকম জায়গায় কফ-থুতু ফেলতে হয়?

১০। চলা, দাঁড়ান, বসা কি ভাবে করা ভাল, আর কি ভাবে করা খারাপ?

১১। বাড়িঘর কি ভাবে পরিষ্কার রাখা দরকার? মাছিরা কি করে? চুন এবং ব্লিচিং পাউডারের গুণ কি?

১২। নোংরা আবর্জনা কি রকম জায়গায় ফেলা উচিত?

১৩। ফিনাইলের গুণ কি?

১৪। পায়খানা কি রকম হওয়া উচিত? গ্রামে পায়খানার কি রকম ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ খাদ্য ও পানীয় ॥

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে নজর দিতে হবে উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের উপর। শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। তা ছাড়া, হাঁটা দৌড়ান, কাজকর্ম করা, পড়াশুনা করা, খেলাধূলা ও ব্যায়াম করা, প্রত্যেকটি কাজেই শরীরের কিছু কিছু ক্ষয় হয়; খাদ্য সেই ক্ষয় পূরণ করে। সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্য চাই।

হজম ও গুরুভোজন — প্রথমত, ক্ষিদে না পেলে খাবে না। আর এমন ভাবেও খাবে না যাতে পেট আইঢাই করে। এই রকম খাওয়াকে বলে গুরুভোজন। গুরুভোজন ভাল নয়, তাতে সব খাদ্য ঠিকমত হজম হয় না, ফলে অম্লরোগ, পেটের অসুখ প্রভৃতি ব্যাধি হয়ে শরীরের ক্ষতিই হয়। কিছুদিন ধরে যদি এমনি বদহজম চলে, তাহলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগ হয়। এই রোগে শরীর একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

গুরুপাক খাদ্য — এমন অনেক খাদ্য আছে যেগুলো সহজে হজম হয় না। এগুলোকে বলে গুরুপাক খাদ্য। গুরুপাক খাদ্য খেলে পেটের নানা অসুখ হতে পারে। কাজেই এমন খাদ্য খাবে যা পুষ্টিকর অথচ সহজে হজম হয়। ডালের মধ্যে কলাই, অড়হর ও মটর ডাল গুরুপাক, বিশেষত পুরান

ডাল, যা ভাল সিদ্ধ হয় না, তা সবচেয়ে খারাপ। ভাতের সঙ্গে মুগ বা মসুর ডাল ভাল। লাল আটার রুটির সঙ্গে মুগ বা ছোলার ডাল পুষ্টিকর।

খাসি বা পাঁঠার মাংস যদি খুব তেল-ঝাল-মসলা দিয়ে রান্না হয়, তাহলে সেটা গুরুপাক হয়। তাজা ছোট মাছ সবচেয়ে ভাল। চিংড়ি মাছ গুরুপাক, পচা মাছ কখনও খাবে না। ডিম বেশী সিদ্ধ হলে গুরুপাক হয়। বেশী-ভাজা মাছ ও তরকারিও গুরুপাক। নরম ভাজা বা সিদ্ধ মাছ-তরকারি সবচেয়ে ভাল। বেশী মসলা দেওয়া রান্না ভাল নয়, তা খেলে পেট গরম হয়, হজমের গোলমাল হয়।

তরি-তরকারির মধ্যে আলু, বেগুন, পটল, উচ্ছে, কচি সিম, লাউ, পালং শাক খুব ভাল তরকারি। তরকারির সঙ্গে কিছু কিছু শাক খাওয়া ভাল, তাতে কোষ্ঠ সাফ হয়। কোষ্ঠ সাফ থাকলে সহজে কোন অসুখ হয় না।

তেল ঘি খাঁটি না হলে খুবই খারাপ, তা খেলে পেটের অসুখ, অম্লরোগ প্রভৃতি হয়। দুধ খুবই পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু জ্বাল দিয়ে বেশী ঘন করলে গুরুপাক হয়। অল্প জ্বাল দেওয়া দুধ ভাল। দই, ঘোল ও ছানা খুব পুষ্টিকর খাদ্য।

ফল খাওয়া খুব ভাল। কলা, পেঁপে, বেল আমাদের দেশে প্রচুর। এগুলো সহজে পাওয়া যায় এবং এগুলো উপকারী ফল। আনারস, কমলালেবুও খুব উপকারী। আম ভাল পাকা না হলে উপকারী নয়। কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল প্রভৃতি গুরুপাক, কখনও বেশী খাবে না।

বাজারের খাবার —দোকানের খাবারের মধ্যে সন্দেশ ও কাঁচাগোল্লা সবচেয়ে ভাল। রসগোল্লা, লেডিকেনী প্রভৃতি খেতে খুব আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু উপকারের চাইতে অপকারই করে বেশী। দোকানের তৈরী লুচি, সিঙাড়া, পুরী প্রভৃতি কখনো খাবে না।

তবে, অনেক সময় কোথাও বেড়াতে গিয়ে দোকানের খাবার ছাড়া আর কিছু যোগাড় করা যায় না। তখন তা-ই খেতে
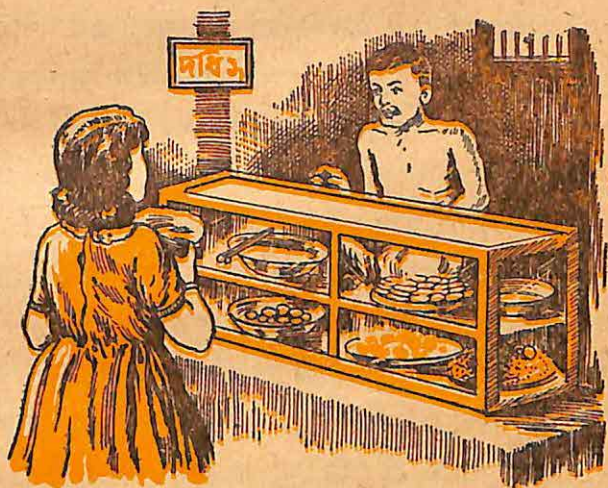
পরিচ্ছন্ন খাবারের দোকান

হয়। তবে ভাল দোকান থেকে খাবে। যে দোকানে কাঁচের আলমারিতে খাবার সাজান থাকে, খাবারে ময়লা পড়তে পারে না, মাছি বসে না, দোকানী বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, সেটাই ভাল খাবারের দোকান।

জল — তারপর পানীয় জলের কথা। আমরা পিপাসায় জল খাই। তৃষ্ণা পেলেই বুঝতে হবে, শরীরের জলের প্রয়োজন হয়েছে। জল শরীরের ভিতরের ময়লা ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং নিজে প্রস্রাব ও ঘামের আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

অনেকের ধারণা, জল বেশী খেলে বুঝি খারাপ হয়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। পরিমিত জল খেলে খারাপ হয় না, ভালই হয়। তবে যখন তখন জল খেতে নেই। যেমন—ভাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশী জল খাওয়া ভাল নয়, ভাত খাওয়ার কিছু পরে জল খাওয়াই ভাল ; না হলে হজমের ব্যাঘাত হয়।

রৌদ্রের সময় দৌড়াদৌড়ি করে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে এক পেট জল খাওয়া একটা রীতিমত বিপজ্জনক কাজ, তাতে সর্দিগর্মি হতে পারে, আর সর্দিগর্মিতে মৃত্যুও হতে পারে।

কড়া রৌদ্রে পরিশ্রম বা দৌড়াদৌড়ি করে পিপাসা পেলে আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে, তারপর জল খাওয়া উচিত।

পরিস্রুত জল — কিন্তু কি রকম জল খাওয়া উচিত? পানীয় জল পরিস্রুত হওয়া দরকার। কলিকাতায় বা মফঃস্বলের কোন কোন শহরে যেখানে জলের কল আছে, সে জল পরিস্রুত। কিন্তু যেখানে জলের কল নেই, সেখানকার টিউব-ওয়েল, পাতকুয়া বা ইদারার জল ভাল, কারণ সে জল নীচের চার পাশের বালিমাটির ভিতর দিয়ে চুইয়ে পরিষ্কার হয়ে আসে।

কুয়ো — এখন একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, এই সব কুয়োর চারদিক পরিষ্কার থাকা কত দরকার। যদি কোন কুয়োর কাছাকাছি কুয়ো-পায়খানা বা পচা ময়লা খানা-ডোবা

থাকে, তাহলে ঐসব ময়লার কতক অংশ কুয়োর জলে মিশতে পারে। এই রকম কুয়োর জল না খাওয়াই ভাল। জলের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকলে এই রকম কুয়োর জলও ফুটিয়ে তারপর ফটকিরি দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে খেতে হয়। কুয়ো যত গভীর হয়, তার জলও তত ভাল হয়। কুয়োর মুখ ঢেকে রাখা বিশেষ দরকার। নয়তো উপর থেকে নানা ময়লা ভিতরে পড়তে পারে। কুয়োর জল কোন কারণে নোংরা হলো কতকটা ব্লিচিং পাউডার কিংবা পারম্যাঙ্গানেট-অব-পটাশ দিলে জল পরিষ্কার হয়ে যায়।

পুকুর — সব জায়গার কুয়োও থাকে না; সেসব জায়গায়, এবং অধিকাংশ গ্রামেই লোকে সাধারণত পুকুরের
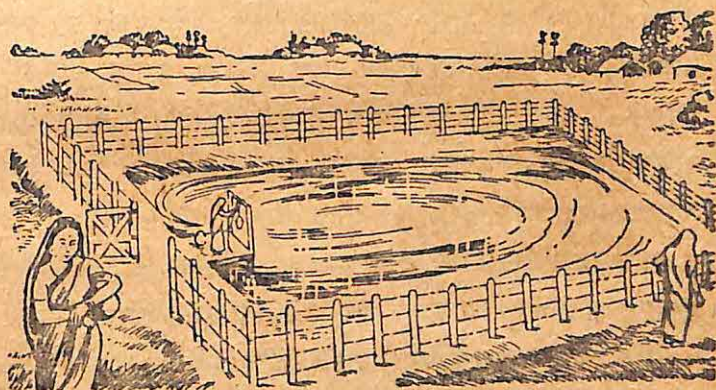
খাবার জলের পুকুর। মাচার উপর থেকে জল তুলছে।

জল খায়। খাবার জলের পুকুর আলাদা থাকা উচিত। খাবার জলের পুকুরে চারদিকে উঁচু পাড় থাকা চাই,— যাতে বাইরের

নোংরা জল পুকুরে এসে পড়তে না পারে। পুকুরের পাড়ে জলের ধারে গাছপালা থাকাও ঠিক নয়। কারণ, তাতে ঐ সব গাছের পাতা জলে পড়ে পচে জল নষ্ট করতে পারে। ঐ পুকুরে স্নান করা বা অন্য প্রকারে জল ময়লা করা নিষেধ থাকবে। এই রকম পুকুরে মাছ থাকলে ভাল হয়। কারণ, জলে নানা পোকা, কীট প্রভৃতি জন্মায়। মাছ সেগুলি খেয়ে ফেলে। তাতে জল পরিষ্কার থাকে।

তবে একটা কথা মনে রাখবে, কুয়োর জলই হোক, আর পুকুরের জলই হোক, সব সময় পরিস্রুত করে নেবে।

জল পরিস্রুত করা — কি করে জল পরিস্রুত করবে? তার সহজ উপায়, প্রথমে জলকে আগুনে ফোটাতে হবে। তাতে জীবাণুগুলি মরে যাবে। তারপর সেই ফোটান জল ঠাণ্ডা হলে, একটা পরিষ্কার লম্বা কাঠির ডগায় পরিষ্কার ন্যাকড়ায় এক ডেলা ফটকিরি বেঁধে সেই জলের মধ্যে ডুবিয়ে বারকয়েক ঘুরিয়ে তুলে নেবে। কয়েক ঘণ্টা পরে সেই জল আস্তে আস্তে আর একটা কলসীতে ঢেলে নেবে। সব জলটা ঢেলে নেবে না; কারণ, দেখতে পাবে উপরের জল পরিষ্কার হয়েছে, আর কলসীর তলায় এক গাদা ময়লা থিতিয়ে আছে। এমন ভাবে উপরের পরিষ্কার জলটা ঢেলে নেবে, যাতে নীচের ময়লাটা ঘুলিয়ে গিয়ে পরিষ্কার জলটাকে আবার নোংরা করে না দেয়। পরিষ্কার জল ঢেলে নিয়ে ময়লা জলটা ফেলে দেবে। তারপর সেই পরিষ্কার জলে একটু কর্পূরের গুঁড়ো ফেলে নেড়ে দিলেই জলটা খেতে ভাল হবে।

শরবত ও ডাব— শহরে, বাজারে বা মেলায় শরবত ও আইসক্রিম বিক্রি হয়। অনেকে সেগুলি খেতে ভালবাসে। কিন্তু সেগুলি যারা তৈরি করে, তারা নোংরা হাতে, নোংরা জলে, নোংরা পাত্রে সেগুলি তৈরি করে; কাজেই সেগুলি খাওয়া উচিত নয়। ঘরে মিছরি বা চিনি ভিজিয়ে একটু লেবুর রস দিয়ে শরবত তৈরি করলে সেটা হবে বাজারের চেয়ে ঢের ভাল ও পরিষ্কার শরবত। ঘোলের শরবতও খুব ভাল। ডাবের জলও খুব উপকারী এবং সুস্বাদু।

অনুশীলনী

১। আমাদের শরীরের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন কেন? কি রকম খাদ্য খাওয়া উচিত? বদহজম হয় কেন? হলে কি ক্ষতি হয়?

২। গুরুপাক খাদ্য কাহাকে বলে? কয়েকটি গুরুপাক খাদ্যের নাম লিখ।

৩। বাজারের খাবার খাওয়া ভাল নয় কেন? বাড়িতে তৈরী খাবার ভাল কেন?

৪। জলপানে শরীরের কি উপকার হয়? কি রকম জল পান করা উচিত? জল পরিষ্কার এবং পরিস্রুত করবার উপায় কি?

৫। ভাত খেতে বসে বেশী জল খাওয়া উচিত নয় কেন? রোদে দৌড়াদৌড়ি করে এসেই জল খাওয়া ভাল নয় কেন?

৬। কুয়ো, নলকূপ বা ইঁদারা কি রকম জায়গায় হওয়া উচিত? কেন?

৭। খাবার জলের পুকুর কেমন হওয়া উচিত?

৮। সবচেয়ে ভাল দুটি পানীয়ের নাম লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ব্যায়াম ও বিশ্রাম ॥

দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করাকে ব্যায়াম বলে। ব্যায়ামে দেহে রক্ত চলাচল ভাল হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবল ও শক্ত হয়, হজম ভাল হয়, ক্ষুধা বাড়ে। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যায়াম ভাল নয়, তাতে শরীর খারাপ হয়। পরিশ্রমের কাজ করলেও ব্যায়ামের ফল হয়।

ভোরের বাতাসে বেড়ান

ছোটদের ব্যায়াম — ছোটদের উপযুক্ত ব্যায়াম হল হাঁটা, দৌড়ান, লাফান, ড্রিল করা, সাঁতার কাটা, নানা প্রকারের খেলাধুলা প্রভৃতি ; আবার বাগান করবার জন্য মাটি কোপান,

গাছে জল দেবার জন্য কুয়ো থেকে জল তোলা, বালতি করে জল বয়ে আনা ইত্যাদিও ব্যায়ামের সামিল।

ভোরে উঠে পায়খানা করে, মুখ ধুয়ে যদি খোলা মাঠে বা নদীর ধারে বেড়াতে পার, তাহলে খুব উপকার হয়। বেড়িয়ে এসে তারপর কিছু খেয়ে পড়তে বসবে ; দেখবে শরীর মন দুইই ভাল থাকবে। বেশী রাত্রি অবধি জাগবে না। সকাল সকাল শোবে—তাহলেই খুব ভোরে উঠতে পারবে। ভোরের বাতাস ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার ; ভোরে বেড়াতে ভালও লাগবে, একটু ব্যায়ামও হবে, আর শরীরের উপকারও হবে। খালি গায়ে বেড়াবে না, গায়ে একটা জামা থাকা চাই— গ্রীষ্মকালে গেঞ্জি বা পাতলা জামা, আর শীতকালে গরম জামা ; নইলে ঠাণ্ডা লেগে সর্দিকাশি হতে পারে। রোজ একটু একটু দৌড়ান অভ্যাস করলে, শরীরের পক্ষে ভাল হয়।
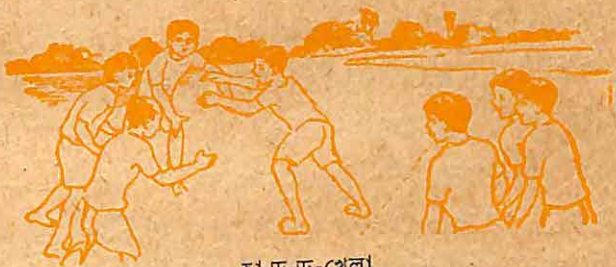
হা-ডু-ডু-খেলা

বিকালে মাঠে খেলা করবে। যে খেলাতে একটু দৌড়াদৌড়ি আছে, সেই খেলাই ভাল ; বসে বসে যে খেলা হয়, সে খেলা কোন কাজের নয়। হা-ডু-ডু ও ফুটবল খেলা শরীরের পক্ষে খুব ভাল। স্কুলে ড্রিল করাও খুব ভাল।

ছোট ছোট কাজকর্ম করে যে ব্যায়ামের কাজ হয়, তার মধ্যে বাড়িতে বা স্কুলে ফুলের বা সবজির বাগান করা সবচেয়ে ভাল। একসঙ্গে কাজ, আনন্দ আর ব্যায়াম এমন আর কিছুতে হয় না। অল্প অল্প মাটি কোপান, মাটির ডেলা ভেঙে দেওয়া, আগাছা উপড়ে ফেলা, গাছে জল দেওয়া, দরকার মতো একটু বেড়া বেঁধে দেওয়া—এই সব ছোট ছোট পরিশ্রমের কাজে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়া-চড়া হয়। একটা দরকারী কাজের সঙ্গে ব্যায়ামও হয়, তারপর ফুল ফল হলে তো আনন্দও হয় খুব।

বিশ্রাম—ব্যায়াম, খেলাধূলা, বা অন্যান্য রকম পরিশ্রমের পর শরীর ক্লান্ত হয়। তখন বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রাম করলে শরীর আবার সুস্থ ও সবল হবে। ছায়ায় খোলা বাতাসে বসে, কিংবা ঘরে এসে একটু শুয়ে বিশ্রাম করতে হয়। বিশ্রামের পর আবার দরকারমত কাজ করবে। কাজের পর একটু বিশ্রাম করে কিছু খাওয়া ভাল।

নিদ্রা—সারাদিনের নানা কাজে—পড়াশুনা, খেলাধূলা, ব্যায়ামে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়, তাতে শরীরের ক্ষয় হয়। সে ক্ষয় পূরণ করতে যেমন খাওয়ার প্রয়োজন, তেমনি ঘুমেরও প্রয়োজন। রাত্রে খেয়েদেয়ে যখন ঘুমোও, তখন শরীরে শক্তি সঞ্চিত হয়। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে শরীরটাকে সবল বোধ কর। ঘুম না হলে বা রাত জাগলে দেখবে সকালে উঠে শরীরটা ক্লান্ত ও দুর্বল মনে হয়, কোন কাজ করতে ইচ্ছে করে না। কাজেই বুঝতে পারছ, ঘুম একটা বিশেষ দরকারী জিনিস।

রাত্রে যে ঘরে ঘুমোবে, সে ঘরে বাতাস চলাচল করা দরকার। কাজেই ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ রাখবে না, জানালা খোলা রাখবে। মশারির ভিতর শোওয়া ভাল। কারণ, তা না হলে মশায় কামড়াতে পারে।

কাত হয়ে শুলে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয় না

শোবে সোজা কাত হয়ে; চিত হয়ে বা কুঁকড়ি মেরে শোবে না, তাতে শরীরের রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস—হাঁ করে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবে না, মুখ বুজে নাক দিয়ে নিশ্বাস নেবে। নাকের মধ্যে এক এক গোছা লোম থাকে, তাতে বাতাসের ধুলো-ময়লা ছাঁকা হয়ে পরিষ্কার বাতাস ফুসফুসে যায়। তাছাড়া, বাতাসে যদি দুষ্ট জীবাণু থাকে, সেগুলিও নাকের লোমে আটকে যায়, ফুসফুসে ঢুকতে

পারে না। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিলে বাতাসের সঙ্গে ধুলো-ময়লাও ফুসফুসে যায়, আর তাতে শরীর খারাপ হয়।

সকালে মুখ ধোওয়ার সময় আঙুলে করে জল নিয়ে নাকের ছেঁদা পরিষ্কার করলে দেখতে পাবে কত ময়লা বেরোচ্ছে।

॥ আলো, বাতাস ও রৌদ্রের উপকারিতা ॥

আলো—তোমরা জান, দিনের বেলায় আকাশে সূর্য থাকে বলে আলো হয়, আর রাত্রে সূর্য থাকে না বলে অন্ধকার হয়। রাত্রে অন্ধকারে অসংখ্য কীটপতঙ্গ, সাপ-ব্যাঙ নিজেদের আস্তানা থেকে বেরোয়, দিনের আলোয় তারা অন্ধকার ঝোপ-জঙ্গলে বা গর্তে গিয়ে ঢোকে। বাড়িতে কোন ঘরের কোণে অন্ধকার থাকলে তোমরা দেখতে পাবে সেখানে আরশোলা-মশার আড্ডা হয়েছে। আলো তারা সহ্য করতে পারে না। যেখানে আলো যেতে পারে না, সে জায়গা স্যাঁৎসেঁতে, আর দুষ্ট জীবাণুরাও সেখানে বাসা বাঁধে। অনেক কীটপতঙ্গের মতো তারাও আলো সহ্য করতে পারে না বলেই অন্ধকারে থাকে।

রৌদ্র — সূর্যের প্রখর রশ্মিকে রৌদ্র বলে। এই রৌদ্রের উপকারিতা অসীম। ভিজে স্যাতসেঁতে জিনিস বা জায়গাকে রৌদ্রে শুকিয়ে দেয়, তার সঙ্গে অনেক দুষ্ট জীবাণুও মরে যায় নোংরা, ময়লা, পচা আবর্জনা থেকে যে বিষাক্ত গ্যাস জন্মে, রৌদ্র সেগুলি পুড়িয়ে দেয়। এই ভাবে রৌদ্র অনেক রোগের মূল ধ্বংস করে রোগ নিবারণ করে। বাতাসে যে অসংখ্য দুষ্ট জীবাণু ভেসে বেড়ায়, অনেক নোংরা গ্যাস মিশে থাকে, রৌদ্র

সেগুলিকেও ধ্বংস করে বাতাসকেও বিশুদ্ধ করে। তাহলেই দেখ, রৌদ্র আমাদের পক্ষে কত উপকারী।

বায়ু — বায়ু ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। একটু সময় শ্বাস বন্ধ করলেই প্রাণ ধড়ফড় করে, আবার শ্বাস নিলে তবে শান্তি হয়। শ্বাস-কার্যের সঙ্গে বায়ু আমাদের বুকের ভিতরে ফুসফুসে ঢুকে আমাদের রক্ত পরিষ্কার করে। যে বায়ু আমাদের শরীরে ঢুকে রক্ত পরিষ্কার করে, সেই বায়ুই যদি অপরিষ্কার হয়, তাহলে বায়ুর নোংরা ময়লা আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে রক্তকে আরো দূষিত করবে। তাই বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যে একান্ত দরকার।

আলো-বাতাসযুক্ত বাড়ি

বাতাসে সূক্ষ্ম ধূলার কণা থাকে, দূষিত গ্যাস থাকে, কত রকমের জীবাণু থাকে। শহরে কল-কারখানার চিমনির ধোঁয়া, গ্রামে পচা খানা-ডোবার দূষিত গ্যাস, মরা-পচা জীবজন্তুর দেহ, মলমূত্র, কফ প্রভৃতি থেকে রোগের জীবাণু বাতাসে মেশে।

রৌদ্র বাতাসের এই সব দূষিত গ্যাস ও জীবাণুকে পুড়িয়ে বাতাসকে বিশুদ্ধ করে। খোলা মাঠ, নদীর ধার প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর রোদ লাগে। কাজেই সেই সব জায়গায় বায়ু অনেক পরিষ্কার থাকে।

ঠিক এই জন্যই খোলা আলো-বাতাসে বাড়ি করলে লোকে নীরোগ ও সুস্থ থাকে।

।। আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা ।।

পোশাক : শীত আর গ্রীষ্ম — অশিক্ষিত বনবাসী মানুষ বেশী কাপড়চোপড়ের ধার ধারে না। কিন্তু শিক্ষিত সভ্য মানুষের কাপড়চোপড় লাগে একটু বেশী। ধুতি বা প্যান্ট, গেঞ্জি, শার্ট, কোর্ট, শাড়ী, সেমিজ, ব্লাউজ, চাদর প্রভৃতির ব্যবহার সভ্য মানুষের লক্ষণ। কাপড়চোপড় শুধু সভ্যতার অঙ্গ বা দেহের শোভাই নয়, শীত-গ্রীষ্ম থেকে দেহকে বাঁচানর জন্যও কাপড়-চোপড়ের দরকার। গরমের সময় শরীরকে রোদ ও তাপ থেকে রক্ষার জন্য পাতলা সুতির জামাকাপড়ই যথেষ্ট, কিন্তু শীতকালে কাপড়চোপড় মোটা ও গরম হওয়া চাই। গ্রীষ্মকালে যেমন মোটা ও গরম জামা পরা যায় না, শীতকালে তেমনি পাতলা সুতি কাপড়ে শীত নিবারণও হয় না, আর ঠাণ্ডা লেগে অসুখও করতে পারে। কাজেই কাপড়চোপড় সময়ের উপযোগী হওয়া দরকার।

নিদ্রা : শীত ও গ্রীষ্ম — গ্রীষ্মকালে গরমে অনেক সময় প্রাণ আইঢাই করে, রাত্রে খোলা হাওয়ায় শুয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেটা ভাল নয়, তাতে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে

পারে। ঘরে মশারির ভিতরই শোওয়া উচিত, আর গরমের জন্যে পাখার বাতাসই ভাল। ঘরে হাওয়া চলাচলের দিকেও নজর রাখা চাই।

আবার শীতকালে অনেকে লেপ মুড়ি দিয়ে শুতে ভালবাসে। সেটাও উচিত নয়। মাথা-মুখ লেপে ঢেকে শুলে লেপের ভিতরে বাতাস ঢুকতে পারে না ; লেপের ঢাকার ভিতরে যেটুকু বাতাস থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসে সে বাতাসটুকুও অল্প সময়ের মধ্যে দূষিত হয়ে যায়, আর সেই দূষিত বাতাসে শ্বাস নিলে শরীরের ক্ষতি হয়। মাথা-মুখ লেপের বাইরে রেখে, গলা পর্যন্ত লেপ ঢাকা দিয়ে ঘুমান উচিত, তাতে পরিষ্কার বাতাসেই শ্বাস-কার্য চলে, শরীরে কোন ক্ষতি হয় না।

বিছানা রৌদ্রে দিচ্ছে

আবার শীতকালে বালিশ, লেপ-তোশকও রোজ বা দুই একদিন অন্তর রৌদ্রে দিলে সেগুলি গরম থাকে বলে ঘুমিয়ে

আরামও হয় বেশী। গরম জামা, আলোয়ান, কম্বল প্রভৃতিও রৌদ্রে দেওয়া ভাল, তাতে এই সব পোশাকে পোকাও থাকতে পারে না, আর পরে আরামও হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে এ সবই দরকার।

অনুশীলনী

১। ব্যায়াম কাকে বলে? ব্যায়াম করলে কি হয়? ছোটদের কয়েকটি ব্যায়ামের ন'ম কর।

২। কোথায় কি ভাবে বেড়ান ভাল? কি কি কাজে হালকা ব্যায়াম হয়?

৩। বিশ্রামের প্রয়োজন কি? কি ভাবে বিশ্রাম করা উচিত?

৪। নিদ্রার প্রয়োজন কি? কি ভাবে কোথায় নিদ্রা যাওয়া উচিত?

৫। শ্বাস-প্রশ্বাস কি ভাবে নেওয়া ভাল, আর কি ভাবে নেওয়া খারাপ? কেন?

৬। আলো ও রৌদ্রের উপকারিতা কি?

৭। বায়ু না হলে জীবন বাঁচে না কেন? কি ভাবে বায়ু দূষিত হয়? বায়ু দূষিত হলে কি হয়?

৮। গ্রীষ্মকালে রাত্রে খোলা জায়গায় খালি গায়ে ঘুমান ভাল নয় কেন? শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে শোওয়া ভাল নয় কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

॥ কয়েকটা সাধারণ রোগের কারণ ও প্রতিকার ॥

সর্দি-কাশি — বেশী ঠাণ্ডা লাগলে বা বেশ খানিকক্ষণ রৌদ্রে তেতে এসে বিশ্রাম না করেই স্নান করলে বা গায়ে জল লাগালে সর্দি-কাশি হয়। রাত্রে খালি গায়ে খোলা জায়গায় শুলে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হয়। ভোরে খালি গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে সর্দি-কাশি হতে পারে। নদীতে বা পুকুরে অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে স্নান করলে, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হতে পারে। বৃষ্টিতে বেশী ভিজলেও সর্দি-কাশি হয়। কাজেই সব সময় নজর রাখবে, শরীরে যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে। বৃষ্টিতে ভিজবে না, রাত্রে বা ভোরে খালি গায়ে খোলা হাওয়া লাগাবে না। অনেক সময় হজমের গোলমাল হয়েও সর্দি হতে পারে, কাজেই পেটকে ঠাণ্ডা রাখবে; এমন কিছু খাবে না, যাতে পেট গরম হয়।

জ্বর — আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া জ্বর একটি সাংঘাতিক রোগ। এই রোগে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। ম্যালেরিয়ার জীবাণু শরীরে একবার ঢুকলে সহজে মরে না। এই জীবাণু মারার ওষুধ হচ্ছে কুইনাইন। নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একটা দুটো কুইনাইনের ট্যাবলেট বা বড়ি খেলে ম্যালেরিয়া ধরতে পারে না। পচা পুকুর, খানা-ডোবা, ঝোপ-জঙ্গল হচ্ছে মশার জন্মস্থান

পুঁজ হয় তাকেই বলে খোস। সারা গা খোসে ভরে গেলে তাকে বলে পাঁচড়া। খোস-পাঁচড়ায় গায়ে ব্যথাও হয়, আর খুব চুলকায়। খোস-পাঁচড়া ছোঁয়াচে রোগ। এক রকম জীবাণু এই রোগ

খোসের পোকা

খোসের রোগী

সৃষ্টি করে। এ রোগ যে বাড়িতে একজনের হয়, সে বাড়ির লোক যদি রোগীর গা ঘেঁসে বসে, এক বিছানায় শোয়, রোগীর কাপড়-গামছা ব্যবহার করে, তাহলে খোসের রস গায়ে লেগে তাদেরও খোস-পাঁচড়া হয়। সুতরাং রোগীর কাছ থেকে দূরে থাকবে। খোস হলে স্কুলে যাবে না। চালমুগরার তেল বা নিমতেল মাখলে এ রোগ সারে। খোস আগে কার্বলিক সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। তারপরে তাতে নিমতেল লাগিয়ে দিতে হয়। সর্বদা গা পরিষ্কার রাখলে, রোজ সরষের তেল মেখে স্নান করলে এসব চর্মরোগ হয় না।

কলেরা — কলেরা হলে খুব পাতলা জলের মতন দাস্ত হয়, আর জলের মতো বমিও হয় বারবার। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, রোগী খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে, হাতে পায়ে খিল ধরে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা না করালে রোগী ২।১ দিনের মধ্যে মারা যায়। রোগীর শরীর থেকে সব জল বেরিয়ে যায় বলে রোগীর খুব জলতেষ্টা পায়। কিন্তু খুব সামান্য সামান্য ডাবের জল ছাড়া অন্য পানীয় খেতে দিতে নেই।

জলের মতো দাস্ত আর বমির মধ্যেও কলেরার জীবাণু থাকে অসংখ্য। তাতে মাছি বসে, তখন মাছির পায়ে জীবাণু লেগে যায়, আর সেই মাছি অন্য জায়গায় গিয়ে খাদ্যে বসে। এভাবে বসলে সেই সব খাদ্যেও কলেরার জীবাণু লেগে যায়। সে খাদ্য যে খায়, তারই কলেরা হয়। এই জীবাণুগুলো খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে। একটা থেকে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক হয়ে যায়।

কাজেই, যেখানেই একজনের কলেরা হয়, সেখানে সকলেরই খুব সাবধান হওয়া উচিত। রোগীর দাস্ত আর বমি মাটির সরায় ধরে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। কাপড়চোপড়েও জীবাণু লাগে বলে রোগীর কাপড়চোপড়, বিছানা প্রভৃতি কখনো পুকুরে ধুতে নেই, ধুলে সেখান থেকেই সারা গ্রামে কলেরা ছড়ায়। কুয়োর ধারেও সেগুলি কাচতে নেই। সবচেয়ে ভাল সেগুলি পুড়িয়ে ফেলা। তা না পারলে, তোলা জলে কলেরার জীবাণুনাশক ওষুধ মিশিয়ে, সেই জলে রোগীর কাপড়চোপড় সিদ্ধ করে কাচতে হয়।

রোগীর সেবা যারা করবে, তাদেরই দেহে রোগের জীবাণু ঢোকার ভয় আছে। তাই তাদেরও কলেরা নিবারক ইনজেকশন নিতে হবে। যেখানেই একজনের কলেরা হবে, সেখানেই যদি সকলে এই ইনজেকশন নেয়, তাহলে কলেরা হওয়ার ভয় আর থাকে না। না হলে খুব তাড়াতাড়ি রোগটা ছড়িয়ে পড়ে, আর মহামারী মড়ক হয়ে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়।

বসন্ত—এটাও অতি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। এতে রোগীর সর্বাঙ্গে মুসুরির ন্যায় গুটি হয়, আর বেদনা হয়।

মায়ের বসন্ত হয়েছে। ছেলেটি টিকা নিয়ে মায়ের সেবা করছে।

কয়েকদিন পরে সেইসব গুটি যখন পাকে, পুঁজ হয়, তখন বেদনায় রোগী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পায়। এ রোগ গ্রামে বা পাড়ায়

পাড়ায় দেখা দিলেই সকলেরই বসন্তের টিকা নেওয়া উচিত। টিকা নিলে আর বসন্ত হওয়ার ভয় থাকে না। যারা বসন্ত রোগীর সেবা করবে, তারা যদি টিকা না নেয়, তাহলে তাদেরও বসন্ত হয়।

বসন্ত রোগীর পুঁজে জীবাণু থাকে অনেক। সেই পুঁজ রোগীর জামাকাপড়ে লাগে। কাজেই রোগীর জামাকাপড় পুড়িয়ে ফেলাই সবচেয়ে ভাল, নইলে গরম জলে বা জীবাণু-নাশক ওষুধ মিশান জলে সেগুলি ধুয়ে নেবে। বসন্তের গুটিগুলি যখন শুকিয়ে যায় তখনই হল বিপদের আশঙ্কা। কারণ,

টিকা না নেওয়ায় বসন্ত হয়েছে

এই খোসাগুলিতে রোগের জীবাণু থাকে অসংখ্য এবং নানা-ভাবে এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই খোসাগুলি খুব সাবধানে গা থেকে তুলে এক জায়গায় রাখবে; তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেবে। তাহলে জীবাণুগুলি মরে যাবে।

বসন্ত হলে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। সেটি হচ্ছে, বসন্ত রোগীকে বাড়ির আর সকলের থেকে আলাদা করে রাখবে এবং সব সময় তাকে মশারির ভিতর রাখবে।

বসন্ত রোগ দেখা দিলেই সকলকেই টিকা নিতে হবে। এই আসল বসন্ত ছাড়া আর এক রকমের বসন্ত আছে। তাতে

সকলে বসন্তের টিকা নিচ্ছে

গুটির মধ্যে পুঁজের বদলে জল হয়। তাই তাকে **জলবসন্ত** বা পানিবসন্ত বলে। সে রোগটা আসল বসন্তের মতো মারাত্মক না হলেও তার সম্বন্ধে সাবধানতা আসল বসন্তেরই মতন দরকার।

হাম—এ রোগটা যেন বসন্তের ছোট ভাই, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরই এ রোগ হয়। প্রথমে সর্দিজ্বর হয়, গায়ে ব্যথা হয়, তারপরে সর্বাঙ্গে ঘামাচির মতো ছোট ছোট লাল দানা

দেখা দেয়। এ রোগের জীবাণু থাকে রোগীর কফের মধ্যে, আর ঘাম সেরে যাবার পর বসন্তের মতন সে সূক্ষ্ম গুঁড়ো ছাল ওঠে, তার মধ্যে। বসন্তের ন্যায়ই মাছি আর বাতাসের সাহায্যে এই সব জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্য শিশুদের শরীরে ঢোকে। সুতরাং এ রোগেও বসন্তের মতনই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

অনুশীলনী

১। সর্দি-কাশি কেন হয়? জ্বর কেন হয়?

২। মশারির উপকারিতা কি? ম্যালেরিয়া কেমন করে হয়? ম্যালেরিয়ার ওষুধ কি?

৩। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ কি? রোগটা কি ভাবে ছড়ায়?

৪। পেটের অসুখ হয় কেন?

৫। চুলকানি আর খোস-পাঁচড়ায় তফাত কি? চুলকানি ভাল হয় কিসে? খোস ভাল হয় কি করলে?

৬। টাইফয়েড রোগের লক্ষণ কি?

৭। কলেরা হলে রোগীর কি অবস্থা হয়? কলেরার বিষ ছড়ায় কি করে? গ্রামে কলেরা হলে কি করতে হয়?

৮। বসন্ত রোগের লক্ষণ কি? বসন্ত রোগীর কাপড়-বিছানা কি করা উচিত? গ্রামে বসন্ত হলে কি করতে হয়?

পঞ্চম অধ্যায়

।। আকস্মিক দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা ।।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কত জ্ঞান, কত কাজ, কত সাবধানতা দরকার, তা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। এখন, হঠাৎ যেসব দুর্ঘটনায় পড়ে মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়, সেই সব বিপদে প্রথমেই কি ব্যবস্থা করতে হয়, সেগুলি জানলেই শরীর সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটা মোটামুটি সম্পূর্ণ হবে।

ছড়ে যাওয়া — মনে কর হঠাৎ শরীরের কোন জায়গা ছড়ে গেল। তখন কি করবে? সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গায় ডেটল লাগিয়ে দাও। যদি বেশী ছড়ে গিয়ে না থাকে তবে এতেই কাজ হবে। আর বেশী ছড়ে গেলে প্রথম ডেটল লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করে নাও। তারপর সেই জায়গাটা ভাল করে ধুয়ে মুছে বোরিক পাউডার লাগিয়ে পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দাও। ২।৩ দিনের মধ্যেই ঘা সেরে যাবে। ডেটল বা বোরিক পাউডার না থাকলে পান খাওয়ার চুন ও হলুদ বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে ছড়ে যাওয়া জায়গায় লাগিয়ে দেবে।

কেটে যাওয়া — ধর পেন্সিল কাটতে গিয়ে হঠাৎ আঙুল কেটে বসলে। কাটা জায়গায় খানিকটা ডেটল লাগিয়ে বা চুনে-হলুদে মিশিয়ে পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দাও। রক্ত পড়া বন্ধ হবে, ব্যথাও হবে না। যদি পড়ে গিয়ে কোন ময়লা জিনিসের খোঁচা লেগে কেটে যায়, তাহলে সেই ময়লার বিষ শরীরের রক্তের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ

হতে পারে। তাতে রোগী মারাও যেতে পারে। সেরকম হলে কাটা জায়গায় ডেটল লাগিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দেওয়ার পর ডাক্তারের কাছে গিয়ে টিটেনাস নিবারক ইনজেকশন নেবে। অসাবধানে হোঁচট খেয়ে পায়ের নখ উঠে গেলেও এই রকম চিকিৎসাই করতে হয়।

আঘাত লাগা বা মচ্‌কে যাওয়া—অসাবধানে চলতে চলতে উচু-নীচু জায়গায় পা পড়ে পা মচ্‌কে যেতে পারে, কিংবা পড়ে গিয়ে বা কিছুতে গুঁতো খেয়ে শরীরের কোথাও চোট লাগতে পারে। এসব হলে সেই জায়গাটা ফুলে ওঠে এবং বেদনা হয়। এরকম কিছু হলে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিতে হয়। বরফ যোগাড় করতে পারলে বরফ দেওয়াই সবচেয়ে ভাল। ঠাণ্ডায় ব্যথাটা একটু কমলে চুন আর হলুদ বাটা মিশিয়ে একটু গরম করে, তাই নিয়ে বেঁধে দিলে ব্যথা সেরে যায়।

উচু-নীচু জায়গায় পা পড়ে কুঁচকিতেও টান লাগতে পারে, আর তাতে কুঁচকি ফুলে ব্যথা হতে পারে। সেরকম হলে চুন আর মধু মিশিয়ে লাগিয়ে দিতে হয়। সেটা আপনি শুকিয়ে যায়, কুঁচকিও সেরে যায়।

পুড়ে যাওয়া—শরীরের কোন জায়গা কোন রকমে পুড়ে গিয়ে ফোসকা হলে খুব জ্বালা করে আর যন্ত্রণা হয়। পোড়া জায়গায় স্পিরিট ঢেলে দিলে ঠাণ্ডা হয়, জ্বালা-যন্ত্রণা কমে। জল কখনো দেবে না, তাতে আরো ফোসকা হয়। কলার বাকল বা কলা গাছের খোলা নিংড়ে তার রস পোড়া জায়গায় দিলেও

ঠাণ্ডা হয়, উপকারও হয়। তারপর ডাক্তারী ওষুধ, মলম লাগাতে হয়। ফোসকাগুলি গেলে দেওয়া ভাল নয়, আর যদি কোন ফোসকা গলেই যায়, তাহলে তার ছাল তুলে ফেলবে না। তাতে ঘা হয়ে যায়।

কাপড়ে আগুন লাগা — হঠাৎ কোন রকমে যদি পরনের কাপড়জামায় আগুন ধরে যায়, তাহলে ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে কখনো দৌড়াদৌড়ি করবে না। তাতে বাতাস পেয়ে আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। পায়ের দিকের আগুন ক্রমে মাথার দিকে উঠে পড়বে আর সর্বাঙ্গ পুড়ে যাবে।

তাহলে কি করবে? টপ করে মাটিতে শুয়ে পড়বে আর গড়াগড়ি দেবে। ঘাবড়াবে না। দেখবে, আগুন নিভে যাবে।

আগুন লাগলে গায়ে কম্বল চাপা দেবে

অন্য কোন ছেলেমেয়ের গায়ে যদি আগুন লাগে, তাকে টেনে মাটিতে শুইয়ে ফেলবে, আর কম্বল বা থলের মতো কোন মোটা-কাপড় চাপা দিয়ে দেবে, এবং চাপা দেওয়া অবস্থায় তাকে

গড়াগড়ি দেওয়াবে। দেখবে, আগুন নিভে যাবে। আগুন নেভানর পর পুড়ে যাওয়ার চিকিৎসা করাবে।

দুর্ঘটনা হঠাৎ হয়, তাই আকস্মিক বলে। কিন্তু আপনা-আপনি তো সেগুলি হয় না, বোকামি আর অসাবধানতার ফলেই হয়। ধর, একটা ছেলে একটা কুল খেয়ে তার আঁটিটা না ফেলে দিয়ে সেটা মুখে রেখেই হুড়োহুড়ি করে খেলা করছে। হাঠৎ অসাবধানে আঁটিটা তার গলার ভিতর ঢুকে আটকে গেল। হল একটা বিপদ। তখন ডাক্তারের কাছে গিয়ে অনেক কষ্টে সেটাকে বের করতে হয়। কাজেই মুখে কোন বাজে জিনিস পুরে খেলা করা একটা বোকামি এবং বিপজ্জনক।

আবার ধর, একটা ছেলে হয়তো একটা কাঁইবীচি নিয়ে বার বার নাকে ঢোকাচ্ছে; এই বোকার মতন খেলা করতে করতে বীচিটা হঠাৎ একবার তার নাকে অনেক ভিতরে ঢুকে গিয়ে আটকে গেল। হল একটা বিপদ। তখনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

কাজেই, নাকে কানে মুখে কোন জিনিস ঢুকিয়ে কখনো খেলা করবে না।

অনুশীলনী

১। কয়েকটি আকস্মিক দুর্ঘটনার নাম কর। ঐ সব দুর্ঘটনার প্রধান কারণ কি?
২। ডেটলের গুণ কি? ধনুষ্টঙ্কার কাকে বলে? কি অবস্থায় হয়?
৩। পা মচ্‌কে গেলে বা কুঁচকি ফুললে কি করতে হয়? পোড়া জায়গায় জল দিলে কি হয়?
৪। কাপড়ে আগুন ধরে গেলে কি করতে হয়?

সমাজ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক রীতি শিক্ষা

॥ রীতিনীতি ॥

তোমরা দেখেছ, তোমরা যেখানে বাস কর, সেখানে তার আশেপাশে আরো কত লোক বাস করে। একলা সাধারণত কেউ থাকতে চায় না। মানুষ এক এক জায়গায় অনেকে একসঙ্গে মিলে মিশে বাস করতে ভালবাসে। যেখানে লোকজন নেই, সেখানে কেউ বাস করতে চায় না। কেননা, এক জায়গায় অনেক লোক বাস করলে, একের বিপদে আপদে অন্য সবাই দেখে, সাহায্য করে, সকলের মঙ্গল আর সুবিধার জন্যে সকলে মিলে নানারকমের ব্যবস্থা করে; স্কুল, পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, পোস্ট অফিস, খেলাধুলার মাঠ প্রভৃতি স্থাপন করে; ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, গয়লা বাস করে বলে সকলের সুবিধা হয়। চাষীরা ফসল বোনে, তার ফলে সকলেই খাদ্য পায়; তাঁতীরা তাঁত বুনে কাপড় তৈরি করে, সকলেই কাপড় পায়। একসঙ্গে বাস করলে এমনি নানারকমের সুবিধা হয়। তাই কেউ কোথাও একা বাস করতে চায় না।

একসঙ্গে এক জায়গায়, এক পাড়ায় বা গ্রামে বা দেশে যারা বাস করে, তাদের নিয়ে হয় সেই জায়গার, পাড়ার, গ্রামের বা দেশের সমাজ। যেমন এক বাড়ির লোকজনদের—বাবা, মা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, ভাই, বোন প্রভৃতি নিয়ে যারা এক বাড়িতে বাস করে—তাদের নিয়ে এক একটি পরিবার, তেমনি অনেকগুলি পরিবার এক জায়গায় বাস করলে তাদের সকলকে মিলিয়ে হয় সমাজ।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ, তুমি শুধু তোমাদের বাড়ির বা পরিবারের একটি লোক নও, তুমি তোমার পাড়া বা গ্রামের সমাজের একটি লোকও বটে। তোমাদের পাড়া বা গ্রামের আর সবাইও তোমাদের সমাজের এক একজন, তোমার মতন তারাও সমাজের এক একটি অংশ।

এখন ভেবে দেখ, সমাজের অংশগুলি যদি ভাল হয়, তাহলে সমগ্র সমাজটাই হবে ভাল ; সমাজের মঙ্গল, উন্নতি সবই হবে ; আর, সমাজের অংশগুলি, অর্থাৎ লোকগুলি যদি মন্দ হয়, তাহলে সমাজটাও হবে মন্দ, সমাজের মঙ্গল বা উন্নতি হবে না। সমাজের মঙ্গল মানে সকলেরই মঙ্গল।

কাজেই তোমার বাড়ির বা পরিবারের লোকজনদের প্রতি তোমার ব্যবহারের যেমন কতকগুলি নিয়ম আছে, সমাজের অন্য লোকজনদের প্রতি তুমি কিরূপ ব্যবহার করবে, তারও কতকগুলি নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলিকে বলে সামাজিক রীতিনীতি ; আর, সেসব রীতিনীতি যারা শেখে আর মেনে চলে, তাদের লোকে বলে সভ্য-ভব্য ছেলেমেয়ে ;

তোমার মতো এঁরাও সমাজের অংশ
(পিওন)

তোমার ম.তা এঁরাও সমাজের অংশ
(নাপিত)

তোমার মতো এঁরাও সমাজের অংশ (ধোপা)

তোমার মতে এঁরাও সমাজের অংশ
(পাহারাওয়ালা)

তোমার মতো এঁরাও সমাজের অংশ
(ঝাড়ুদার)

তোমার মতো এঁরাও সমাজের অংশ (চর্মকার)

আর, যারা তা না শেখে বা না মানে, তাদের লোকে বলে অসভ্য।

।। সৎ ব্যবহার ।।

লোকের সঙ্গে তোমার ব্যবহার ভাল হওয়া যে কত দরকার, তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। এই সব ব্যবহার শিখতে হয়, অভ্যাস করতে হয়—আর, সব শিক্ষার মতন এ শিক্ষাও শুরু হয় নিজের বাড়ি থেকে।

তোমরা জান মা-বাবা, কাকা-কাকি, দাদা-দিদি প্রভৃতিকে গুরুজন বলে। তাঁরা শুধু গুরুজনই নন, তাঁরা ঠাকুর-দেবতার মতন পূজনীয়। তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত নিজের কপালে ছুঁইয়ে প্রণাম করতে হয়। মা-বাবা এবং অন্যান্য গুরুজনের আশীর্বাদ নিয়ে যে কাজই আরম্ভ কর না কেন, সফল হবেই। কাজেই সকালে উঠে বা স্কুলে যাওয়ার

ছেলেটি মাকে প্রণাম করছে

সময়, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়, মা-বাবাকে প্রণাম করে গুরুজনদের প্রণাম করবে।

তুমি মাকে প্রণাম করলে, মা তোমার থুতনিতে বা চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খান, তা তো দেখতেই পাও। ঠিক তেমনি তুমিও ছোট ছোট ভাই-বোনদের চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খাবে। এমনি করে যারা পরস্পরকে ভালবাসে, তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি তো হতেই পারে না, বরং তাতে বাড়িতে বেশ শান্তি থাকে।

বাড়ির লোকদের মতোই পাড়ার বা গ্রামের লোকদের সঙ্গেও আপনজনদের মতন ব্যবহার করবে, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করবে, ছোটদের ভালবাসবে।

স্কুলে শিক্ষক মহাশয় যখন পড়াবেন, মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনবে। একসঙ্গে মিলেমিশে পড়াশুনা করবে, খেলা করবে। স্কুলের সহপাঠীদের ভাই-বোনের মতন মনে করবে। তাদের বাবা-মাকেও গুরুজন বলে মনে করবে।

আর, শিক্ষক মহাশয় তোমাদের গুরুজন। তোমরা তাঁদের দাদা বল; গুরুজন বলে ভালবেসেই তো দাদা বল। রোজ স্কুলে এসে ক্লাসে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে, শিক্ষক মহাশয় এলেই উঠে দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে তাঁকে নমস্কার করবে। তারপর, তিনি বসলে বা তোমাদের বসতে বললে তোমরা বসবে।

স্কুলে ইনস্পেক্টর আসেন, তিনি ক্লাসে এসে তোমাদের দেখে যান, তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ইনস্পেক্টরও গুরুজনদের

একজন। তিনি যখন তোমাদের ক্লাসে আসবেন তখন তোমরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখাবে। ঠিক তেমনি অন্য কোন ভদ্রলোক বা ভদ্র-মহিলা তোমাদের ক্লাস দেখতে এলেও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের সম্মান দেখাবে, তাঁরা বসতে বললে বসবে।
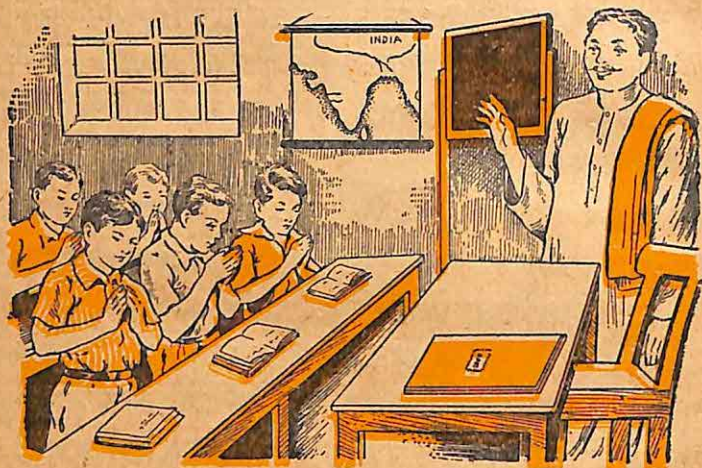
মনোযোগ দিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের কথা শুনবে

বাড়িতে কোন ভদ্রলোক বা ভদ্র-মহিলা তোমার বাবা কিংবা মা'র সঙ্গে দেখা করতে এলে, তাড়াতাড়ি বাবা-মাকে খবর দেবে। তাঁরা যদি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে ঘরে এসে বসতে বলবে।

ধোপা, নাপিত, গয়লা, পিওন, যে কেউ বাড়িতে আসবে, সকলের সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করবে। বাড়িতে ভিখারী এলে তাদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করবে না, মিষ্টি কথা বলবে। সকলেই যেন বলে, ছেলেটি বড় ভাল।

তোমাদের বাড়িতে কাজকর্ম করার জন্যে যদি মাইনেকরা লোক থাকে, তাদের, 'ঝি-চাকর', র াঁধুনি' বলে অপমান করে কথা বলবে না। তারাও তোমাদের পরিবারেরই লোক। কাজেই তাদের দাদা, দিদি বা কাকা, পিসী ইত্যাদি বলে ডাকবে এবং তাদের সঙ্গে আপনজনের ন্যায় ব্যবহার করবে ; তারা যেন সকলেই তোমাকে ভাল বলে, আর ভালবাসে।

বাড়িতে সেরকম লোকজন না থাকলে, বাড়ির কাজে বাবা-মাকে যেটুকু পার সাহায্য করবে।

স্কুলে যাদের সঙ্গে পড়, পাড়ার বা গ্রামের যাদের সঙ্গে খেলা কর, তাদের কারো অসুখ হলে রোজ তাদের খবর নেবে, আর দরকার হলে যেটুকু পার সাহায্য করবে।

তোমার মা-বাবা কিংবা আর কেউ হয়তো ঘরে বসে কথা কইছেন, আর তোমরা ভাই-বোন মিলে সেখানে হুড়োহুড়ি করে খেলা করছ ; এরকম করা ভারি অন্যায়। এতে কথাবর্তায় বাধা দেওয়া হয়, তাঁরা বিরক্ত হন। এমন কাজ কখনও করবে না।

সামাজিক কাজ

যে কাজে সকলেরই মঙ্গল হয়, সেই কাজকে সামাজিক কাজ বলা হয়। সামাজিক কাজের ভিতর এমন কতকগুলি আছে যা একা করা যায় না, অনেকে মিলে একসঙ্গে করতে হয়। যেমন ধর, পাড়ার বা গ্রামের কাঁচা রাস্তার একটা জায়গা নীচু, বর্ষাকালে সেখানে জল জমে কাদা হয়, সকলেরই চলার অসুবিধা হয়। তখন পাঁচজনে মিলে নীচু জায়গাটাতে রাবিশ,

ছাই বা মাটি দিয়ে ভরাট করে দিলে, কিংবা দরকারমত একটা নালি কেটে জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে।

এসব কাজ বড়রাই করে থাকে, কিন্তু তোমাদের মতো ছোট ছেলেরাও তাদের সাহায্য করতে পারে। তোমরা তাদের সঙ্গে থেকে দেখবে শিখবে, তাদের এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করবে।

স্কুলের সামনে এরকম হলে তো তোমরাই সেটা করবে। খেলার মাঠে জল জমলেও সেটা বের করে দেওয়া তোমাদেরই কাজ।

কিন্তু দশজন মিলে যেখানে কাজ করতে হয়, সেখানে একজনকে নেতা করে, তার কথামত সকলকে কাজ করতে হয়। নইলে কাজে বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল হয়, কাজ ঠিকমত হয় না।

মনে কর, পাড়ায় বা গ্রামে বারোয়ারী অথবা সার্বজনীন পুজো হয়, হয়তো বা রথের মেলা হয়। এসব ব্যাপারে অনেক দূর থেকে লোক আসে, অনেক ভিড় হয়। যাতে সকলে সুশৃঙ্খল ভাবে সব দেখতে শুনতে পারে, যাতে ভিড়ে কেউ হারিয়ে না যায়, হারিয়ে গেলে যাতে তাদের ঠিক জায়গায় নিজেদের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, এই সব ব্যবস্থা করার জন্যে একদল কর্মী থাকে। তাদের বলা হয় স্বেচ্ছাসেবক বা ভলান্টিয়ার। স্বেচ্ছায় লোকের সেবা করে বলে ভলান্টিয়ারদের স্বেচ্ছাসেবক বলে। ভলান্টিয়ারের কাজ একটা ভাল সামাজিক কাজ। গ্রামের বড়রাই এই সব ব্যবস্থা করেন, আর ছেলেরা হয় ভলান্টিয়ার।

ভলান্টিয়ারদের একজন নেতা থাকেন, তিনি সবাইকে কাজ ভাগ করে দেন। নেতার উপদেশ মতো নিজের নিজের কাজ বুঝে নিয়ে ভলান্টিয়াররা কাজ করে। তুমি যদি ভলান্টিয়ার হও, ঠিক এমনি ভাবেই কাজ করবে। নিজের কাজ বা জায়গা ছেড়ে অন্য দিকে যাবে না বা মন দেবে না। ভলান্টিয়ারের কাজ করতে করতে যে শিক্ষা হবে, তারই ফলে হয়তো বড় হয়ে একদিন তুমি নিজেই নেতা হয়ে ভলান্টিয়ার দল গঠন করে সুশৃঙ্খলে কাজ চালাতে পারবে।

এখন ভেবে দেখ, যারা একসঙ্গে মিলে কোন কাজ করে— তারা সকলে পরস্পরের সাথী বা সহকর্মী। তুমি এই রকম সাথী বা সহকর্মীদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে? ঠিক যেমন তোমার সহপাঠী বা খেলার সাথীদের সঙ্গে ভাই বা বন্ধুর মতো ব্যবহার কর, সহকর্মীদের সঙ্গেও তেমনি ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে তোমার অচেনাও কেউ থাকতে পারে। থাকলে তার সঙ্গে ভাব করে নেবে। সাথীদের কারো সামান্য ত্রুটি দেখলে রেগে যাবে না, বা ঝগড়া করবে না, যা বলতে হয় বুঝিয়ে বলবে। রাগী মেজাজ ভাল নয়, তাতে অনেক ক্ষতি হয়।

নিঃস্বার্থপরতা

কেবল নিজের সুবিধার দিকেই নজর দেবে না, অপরের সুবিধার দিকেও নজর রাখতে হবে। অপরের অসুবিধা করে, নিজের সুবিধা করা অত্যন্ত অন্যায়। তাকে বলে স্বার্থপরতা; স্বার্থপর লোককে সকলেই মন্দ বলে। বরং নিজের একটু

অসুবিধা হলেও, যদি তাদের সুবিধা হয়, তাহলে নিজের সেই অসুবিধাটুকু সহ্য করেই কাজ করা উচিত ; তাতে সকলেই ভাল বলবে, ভালবাসবে।

ধর, তুমি রেলস্টেশনে, দোকানে বা পোস্ট অফিসে গিয়াছ। সেখানে গিয়েই সকলের আগে জিনিস নেওয়ার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিলে। কাজটা কেমন হয় ? অন্যায় নয় কি ? এতে
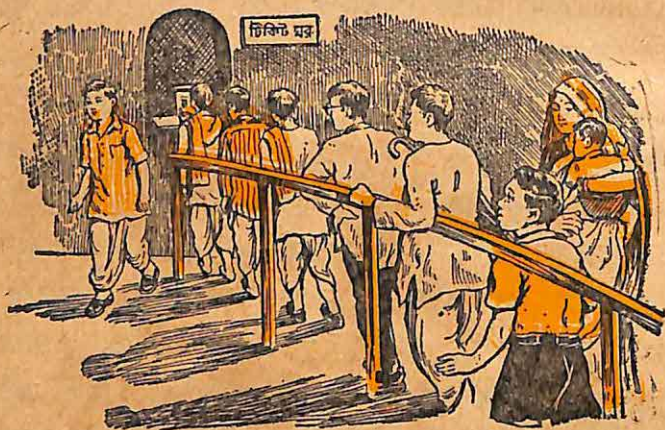
রেলস্টেশনে যাত্রীরা সারি দিয়ে টিকিট কিনছেন

সবাই তোমার উপর চটে যাবে, হয়তো ধাক্কা মেরে তোমাকে সরিয়ে দেবে। যারা আগে এসেছে, তাদের তো আগে জিনিস পাওয়া উচিত। সুতরাং লাইনে পর পর দাঁড়িয়ে একে একে জিনিস নিতে অভ্যাস করা দরকার।

ধর, রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছ, হঠাৎ একটা হোঁচট খেলে বা একটা গরু বা কুকুরের

ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়লে, কিংবা অন্য কারো সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। শহরে রাস্তায় এমন ভাবে চললে তো গাড়ি চাপা পড়ারই ভয় আছে। কাজেই বুঝতে পারছ, চলার সময় সুমুখ দিকে চেয়ে চলা উচিত।

ধর, পথের উপর কেউ আমের বা কলার খোসা ফেলেছে, তুমি অন্যমনস্ক ভাবে চলেছ। হঠাৎ ঐ খোসার উপর পা পড়ে, পা পিছলে তুমি পড়ে গেলে। তাহলে বুঝতে পারছ, পথের উপর আম বা কলার খোসা ফেলা কত অন্যায়। তুমি নিজে

ছেলেটি কলার খোসায় পা পিছলে আছাড় খেয়েছে

তো কখনও ফেলবেই না, অন্যে ফেলছে দেখলেও তাকে বারণ করবে। ঠিক এমনি, যদি দেখ পথের উপর একটা কাঁটা পড়ে আছে, সেটা হয়তো কারো পায়ে ফুটতে পারে, তুমি সেটাকে তুলে ফেলে দেবে।

অন্যায় কাজ নিজে কখনও করবে না, আর অন্যে করলে তাকেও বারণ করবে, অন্যায় বুঝিয়ে দেবে। দরকার হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। সে রকম ক্ষেত্রে ভয়ে পিছিয়ে যাবে না।

তোমরা জান, অনেক দুষ্ট ছেলে রাস্তায় পাগল দেখলে তাকে জ্বালাতন করে, ঢিল মারে। সে রকম ব্যাপার দেখলে দুষ্ট ছেলেগুলিকে বারণ করবে বা তাদের দূরে সরিয়ে দেবে।

ছেলেটি পাগলকে ঢিল মারতে নিষেধ করছে

প্রয়োজন হলে তুমি ঐ দুষ্টু ছেলেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, ভয় করবে না। দেখবে রাস্তার অন্য লোকও তোমার দেখাদেখি তোমার পক্ষে যোগ দিয়ে দুষ্টু ছেলেগুলিকে তাড়িয়ে দেবে।

গরীব-দুঃখী, বুড়ো অন্ধ-আতুর লোকদের প্রতি সব সময় সদয় ব্যবহার করবে। এ ধরনের লোক অনেক সময় শহরের রাস্তা পার হওয়ার জন্যে অন্যের সাহায্য চায়। তোমরা নিজেরা যেমন গাড়ি-ঘোড়া দেখে সাবধানে রাস্তা পার হও, তেমনি

ছেলেটি অন্ধ লোকটিকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিচ্ছে

সাবধানে ঐ সব লোককে হাত ধরে নিয়ে রাস্তা পার করে দেবে। দেখবে সেও যেমন কৃতজ্ঞ হয়ে তোমায় আশীর্বাদ করবে, তোমার নিজেরও তেমনি আনন্দ হবে। ভাল কাজ করতে পারলে যে কত আনন্দ হয়, ভাল কাজ করলেই সেটা বুঝতে পারবে।

তাই বলে একটা ভাল কাজ করে, তা নিয়ে নিজেরা বড়াই করে বেড়ানটা ভাল নয়। ভাল ছেলেরা আপনা-আপনিই ভাল কাজ করে থাকে, লোকে বাহবা দিলে কিনা, তা দেখে না।

অন্যের যাতে অসুবিধা হয়, নিজের সুবিধার জন্য তা করবে না। তুমি যদি পরের সুবিধা-অসুবিধার কথা না ভেবে, সর্বদা কেবল নিজের সুবিধাই খোঁজ, তাহলে আর সকলেও তা-ই করতে পারে। তাতে সমাজের কি দশা হয় ভেবে দেখতো। সকলের সঙ্গে সকলের স্বার্থের দ্বন্দ্ব আর প্রতিযোগিতায় সমাজটা হয়ে দাঁড়াবে যেন একটা জঙ্গলের পশুর ভিড়।

কিন্তু তুমি যদি নিজে নিঃস্বার্থভাবে চলতে পারো, তাহলে অন্যের কাছেও নিঃস্বার্থ ভাব আশা করতে পারো। তাই তুমি সর্বদা পরের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে কাজ করবে, পরের সুবিধা দেখতে গিয়ে নিজের যদি একটু অসুবিধা হয়, তাতেও পিছপা হবে না।

ছেলেটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে বসবার জন্য আসন ছেড়ে দচ্ছে

ধর, তুমি রেলে বা ট্রামে চড়ে কোথাও চলেছ। গাড়িতে খুব ভিড়, তুমি বেঞ্চিতে বসে আছ, এমন সময় সেখানে একজন

বৃদ্ধ বা মহিলা বা ছোট ছেলে কি মেয়ে এসে দাঁড়াল, বসবার জায়গা নেই। তুমি যদি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বসতে দাও, তাহলে কাজটা কি খুব সুন্দর হবে না? তখন তুমি অন্য লোকদেরও স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে বলতে পারবে। পরকে উপদেশ দিতে হলে, নিজে আগে সেই উপদেশ মতো কাজ করে দেখাতে হয়।

মোটকথা, সমাজের লেকেরা তোমার সঙ্গে কথাবার্তায় বা ব্যবহারে যে রকম করলে তোমার সুবিধা হয় বা ভাল লাগে, তুমি সমাজের লোকদের সঙ্গে ঠিক সেইভাবে কথা কইবে বা ব্যবহার করবে। সামাজিক শিক্ষার এটা একটা প্রধান নিয়ম।

অনুশীলনী

১। সমাজ কাকে বলে? সামাজিক রীতিনীতি কাকে বলে? সমাজের মঙ্গল হলে সকলেরই মঙ্গল হয় কি ভাবে?

২। সৎ ব্যবহার কাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩। যেখানে কেউ কথাবার্তা কইছে, সেখানে হুড়োহুড়ি করা অন্যায় কেন? রাস্তায় আম বা কলার খোসা ফেলা অন্যায় কেন? অন্যমনস্কভাবে পথ চলা ঠিক নয় কেন?

৪। কয়েকটি সামাজিক কাজের নাম কর। দশজনে মিলে কাজ করতে হলে মেজাজ কি রকম হওয়া উচিত?

৫। ভলান্টিয়ারদের স্বেচ্ছাসেবক বলে কেন? সহকর্মী বা সাথী কাকে বলে? ভলান্টিয়ারদের কি ভাবে কাজ করা উচিত, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৬। যে কেবল নিজের সুবিধেই দেখে, তাকে কি বলে? লাইনে দাঁড়িয়ে জিনিস কেনা অভ্যেস করা দরকার কেন?

৭। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানর একটা উদাহরণ দাও।

৮। অন্ধ-আতুরদের প্রতি সদয় ব্যবহারের একটা উদাহরণ দাও।

৯। বড়াই করা ভাল নয় কেন? আবদারে ছেলে ও মুখচোরা ছেলের এক-একটা উদাহরণ দাও।

১০। গাড়িতে যেতে লোকের সঙ্গে সৎ ব্যবহারের একটা উদাহরণ দাও।

১১। সামাজিক শিক্ষার একটা প্রধান নিয়ম বল।

সপ্তম অধ্যায়

সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা

গোড়ার দিকে তোমরা ব্যক্তিগত, অর্থাৎ নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার কথা পড়েছ, এখন সমাজগত, অর্থাৎ যাদের সঙ্গে এক গ্রামে বা পাড়ায় বাস কর, তাদের সবাইকে নিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মের কথা তোমাদের বুঝতে হবে।

এক গ্রামে বা এক পাড়ায় যারা বাস করে, বা এক স্কুলে যারা পড়ে, তাদের সকলকে নিয়ে হয় সেখানকার সমাজ। পড়াশুনা, খেলাধূলা, পূজাপার্বণের উৎসব-আনন্দ, আবার মহামারীর সময়ে রোগের মড়ক, বন্যা-সাইক্লোন প্রভৃতি বিপদ-আপদে সকলের সঙ্গে সকলের আপনজনের মতো মেলামেশা ও একযোগে কাজ করা ছাড়া কারো চলে না। কাজেই সকলের স্বাস্থ্যও সকলের সঙ্গে জড়িত, আর সেজন্যে সকলের একসঙ্গে কিছু-না-কিছু কাজ করতে হয়।

ধর, গ্রামে যদি পচা খানা-ডোবা ঝোপজঙ্গল বেশী থাকে, তাহলে গ্রামের সকলেরই স্বাস্থ্যহানি হয়, আর সেজন্যেই সকলে মিলে সে সব সাফ করে ফেলতে হয়।

পাড়ার পথঘাট যদি নোংরা আবর্জনায় ভরা থাকে তাহলেও সকলেরই স্বাস্থ্যহানির ভয় থাকে, আর তাই সকলেরই উচিত একযোগে নজর রাখা, যাতে নোংরা আবর্জনা কোথাও জমতে না পায়। তোমারও উচিত সকলের সঙ্গে একযোগে গ্রাম বা পাড়া

পরিষ্কার করা, আর পরিষ্কার রাখা, যাতে গ্রাম বা পাড়া অস্বাস্থ্যকর না হয়।

ঠিক এমনি, যে স্কুলে অনেকে একসঙ্গে পড়ে, সে স্কুলকেও সকলে মিলে পরিষ্কার রাখতে হবে। তুমি নিজে কখনও কোন ভাবে স্কুলকে নোংরা করবে না, এবং আর সব ছেলেমেয়েদেরও স্কুল নোংরা করতে বারণ করবে। আর সবাই মিলে মাঝে মাঝে—ধর, হপ্তায় একদিন, রবিবারে স্কুলবাড়ি খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করবে। ঘর ও বারান্দার ঝুল ঝাড়বে, ঝাঁট দেবে,

মাঝে মাঝে স্কুলবাড়ি পরিষ্কার করবে

টেবিল চেয়ার বেঞ্চি আলমারি প্রভৃতি ন্যাকড়া দিয়ে মুছবে, উঠান পরিষ্কার করবে, ফুল বা সবজি-বাগান থাকলে সেগুলোর আগাছা উপড়ে পরিষ্কার করে ফেলবে। বাগান করতে হলে কোদাল, খন্তা, কাঁচি, নিড়ানি প্রভৃতি যে সব যন্ত্রপাতি লাগে, সেগুলোকে সর্বদা পরিষ্কার রাখবে, কাজ করার পর সেগুলো

ধুয়ে মুছে রাখবে। স্কুলের আশপাশ বা পিছনেও জঙ্গল হতে দেবে না। কাগজের টুকরো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ঘর ঝাঁটান আবর্জনা সেখানে ফেলবে না, কেউ ফেলে থাকলে তোমরা তুলে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে আসবে। আবর্জনা একটা গর্তের ভিতর ফেলে মাটি চাপা দেওয়াই ভাল। খেলার মাঠও পরিষ্কার রাখবে।

যেখানে পুকুরের জল খেতে হয়, সেখানে সকলে মিলে নজর রাখতে হবে যাতে পুকুরের জল পরিষ্কার থাকে, যাতে কেউ না সে জল নোংরা করে।

নোংরা দোকানের খাবার খাবে না। দল বেঁধে ঐ দোকানে খাবার খাওয়া বন্ধ করবে। সকলে মিলে এই ভাবে চললে দোকানীও ভাল খাবার তৈরি করতে এবং আলমারির মধ্যে খাবার রাখার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবে।

এমনি করে গ্রাম, পাড়া বা স্কুলে স্বাস্থ্য রক্ষার একটা উপযোগী পরিবেশ সর্বত্র গড়ে তোলার নাম সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি।

অনুশীলনী

সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা কাকে বলে? সামাজিক স্বাস্থ্যহানি হয় কি কি কারণে? সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে কি রকমের কাজ করতে হয়?